জাতীয় অর্থনীতির দীর্ঘ মেয়াদী প্রেক্ষিত

এস, এম, আলী আক্কাস

১.ভূমিকাঃ

বাংলাদেশ গত বিশ বছরে যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করে আসছে তার পরিণতি নিয়ে এখন আর সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রায় শতকরা একশ ভাগ বৈদেশিক সাহায্য-নির্ভর উন্নয়ন তৎপরতা তার বাঞ্ছিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। এমতাবস্থায় উন্নয়নের নতুন কৌশল নির্ধারণ জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে।

বর্তমান প্রবন্ধের প্রথম পরিচ্ছেদে বিগত দুই দশকে অনুসৃত উন্নয়ন তৎপরতার ব্যর্থতার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এবং অতি সংক্ষেপে তার কারণ উদঘাটনের প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অর্থনীতির দীর্ঘ মেয়াদী দিক নির্দেশনার ধারণা ও মৌল প্রশ্নগুলি উথাপন করা হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে জাতীয় অর্থনীতির দিক নির্দেশনা প্রশ্নে সম্ভাব্য বিকল্পসমূহ এবং সেগুলির সুবিধা অসুবিধা যুক্তি সহকারে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

২. *সত্তর ও আশির দশকে উন্নয়ন প্রয়াসের ফলাফলঃ*

স্বল্প ও প্রাথমিক পণ্যের রপ্তানি ভিত্তিক কৃষি প্রধান এই দেশের খাদ্য ঘাটতি মিটানো, রপ্তানিমুখী শিল্প স্থাপন ও কৃষি উপকরণ সরবরাহকারী শিল্প গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বেসরকারী দাতা সংস্থা ও অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান থেকে বাংলাদেশ ১ মার্চ ১৯৯১ পর্যন্ত ১১,১৭৬৬ মিলিয়ন ডলার ঋণ গ্রহণ করেছে। উদ্দেশ্য ছিল এ সব সাহায্য কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ দারিদ্রের দুষ্ট চক্র থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। কিন্তু বাংলাদেশের গত দুই দশকের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় দারিদ্র পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি।

মাথাপিছু আয় কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় নিম্ন আয়ের জনগণের ক্রয়ক্ষমতা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। আয় বন্টনের প্রশ্নটি বাদ দিলেও জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি হার তার উর্দ্ধমুখী প্রবণতা বজায় রাখতে পারছে না। বরং বিভিন্ন পরিকল্পনা মেয়াদে জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি হার স্তিমিত হয়ে আসছে।

২.১ জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি ঃ ১৯৭৩ থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত বছরে মোট দেশজ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধিহার ৫·৯% থেকে কমে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক মেয়াদে (১৯৮০–৮৫) ৩·৭% হয়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে (১৯৮৫–৯০) এ হার আরও কমে ৩·৪% এ দাঁড়ায় (সারণী–১)।

মোট দেশজ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি হারের গতি প্রকৃতির এই নিম্নমুখীনতা বহুলাংশে কৃষি ও শিল্পের প্রবৃদ্ধিহারের গতিশীলতার উপর নির্ভর করে। কৃষির প্রবৃদ্ধির গড় হার স্বাধীনতার পর থেকে স্তিমিত হয়ে আসছে। ১৯৭৩–৮০ পর্যন্ত ৭ বছরে কৃষির গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৩·৬%। এটি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে ২·৭% এ নেমে আসে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে কৃষির গড় প্রবৃদ্ধি হার আরো নেমে ১·৭% দাঁড়ায়। অপর পক্ষে, শিল্পের গড় প্রবৃদ্ধি হার দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। এক্ষেত্রে ১৯৭৩–৮০ পর্যন্ত গড় প্রবৃদ্ধির হার ১২·৭% থেকে নেমে দ্বিতীয় পরিকল্পনা মেয়াদে মাত্র ৫·২% এ এসে দাঁড়ায়। তৃতীয় পরিকল্পনা মেয়াদে এ প্রবৃদ্ধি হার ৫·১% ছিল।১৯৮৯–৯০ সালের প্রবৃদ্ধি বাদ দিয়ে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পকিল্পনার প্রথম চার বছরে শিল্পোৎপাদন প্রবৃদ্ধির গড় হার ছিল মাত্র ৪ দশমিক ২ ভাগ (সারণী – ১)। কৃষি ও শিল্পের প্রবৃদ্ধিহারের এই নিম্ন মুখী প্রবণতা তাই মোট জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধির উপর ব্যাপক প্রভাব রেখেছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে কৃষি ও শিল্পোৎপাদন পড়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ ১৯৮৭–৮৮ সালের বন্যা পরিস্থিতি।

২.২ জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধির পতনের কারণ সমুহঃ কৃষি ও শিল্পের প্রবৃদ্ধিসহ মোট জাতীয় আয়ের গড় প্রবৃদ্ধি হারের নিম্নমুখী প্রবণতার মুল কারণ বিনিয়োগের পরিমাণ ও তার অর্থায়ন উৎসে নিহিত। বিনিয়োগের মাত্রা উৎপাদন প্রবৃদ্ধির একটি প্রাথমিক নিয়ামক। ১৯৭৩–৭৪ থেকে বাংলাদেশে বিনিয়োগ প্রতি বছর বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতীয় উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি দেশ তার জাতীয় আয়ের কত অংশ বিনিয়োগ করতে পারছে সেটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ জাতীয় আয়ের সাথে বিনিয়োগের অনুপাতের ক্রমাগত হ্রাস বা বৃদ্ধি মোট জাতীয় উৎপাদনের প্রবৃদ্ধিহারের হ্রাসবৃদ্ধির উপর সরাসরি প্রভাব রাখে। আশির দশকের প্রারম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের বিনেয়োগ তার জাতীয় আয়ের আনুপাতিক হারে ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। বাংলাদেশে বিনিয়োগ জিডিপি অনুপাত ১৯৮০–৮১ সালে ১৬% হতে নেমে ১৯৮৯–৯০ সালে ১১·২% ভাগে দাঁড়ায়। এর অর্থ এই যে, বর্ষ পরম্পরায় জাতীয় আয়ে ভোগের অংশ ক্রমান্বয়ে অধিকতর প্রাধান্য

সারণী— ১

খাতওয়ারী মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) (১৯৭৯–৮০ মূল্যে)

(বিলিয়ন টাকা)

বৎসর	জিডিপি চলতি মূল্যে	জিডিপি ডিফ্লেটর	মূল্য পরিশীলিত জিডিপি ১৯৭৯–৮০ মূল্যে	জিডিপি প্রবৃদ্ধি হার	কৃষি ১৯৭৯–৮০ মূল্যে	কৃষির প্রবৃদ্ধি	শিল্প ১৯৭৯–৮০ মূল্যে	শিল্পের প্রবৃদ্ধি
১৯৭২–৭৩	৪৫·১১	৩৩·৮	১৩৩·৪৬		৭৮·৩৭		১৩·৫০	
১৯৭৩–৭৪	৭১·০৯	৪৭·৫	১৪৯·৬৬	১২·১	৮৬·৫৬	১০·৪	১৫·৪৫	১৪·৪
১৯৭৪–৭৫	১২৫·৭৪	৮১·৩	১৫৫·৬৬	৪·০	৮৫·৬৯	–১·০	২১·৯৪	৪২·০
১৯৭৫–৭৬	১০৭·৪৬	৬১·৯	১৭৩·৬০	১১·৫	৯৫·৬৯	১১·৮	২২·৯৯	৪·৮
১৯৭৬–৭৭	১০৫·৩৬	৬০·০	১৭৫·৬০	১·১৫	৯২·৮০	–৩·০	২৪·৭২	৭·৫
১৯৭৭–৭৮	১৪৬·৩৭	৭৮·২	১৮৭·১৭	৬৬	১০০·৮১	৮৬	২৫·১১	২·০
১৯৭৮–৭৯	১৭২·৮২	৮৮·৪	১৯৫·৫০	৪·৪	৯৯·৩৪	–১·৫	৩০·৯৮	২২·৯
১৯৭৯–৮০	১৯৭·৯৮	১০০·০	১৯৭·৯৮	১·৩	৯৯·৫০	০·২	২৯·৪৯	–৪·৮
১৯৮০–৮১	২৩৩·২৬	১১০·৪	২১১·২৯	৬·৭	১০৪·৮২	৫·৩	৩১·৭১	৭·৫
১৯৮১–৮২	২৬৫·১৪	১২৪·৪	২১৩·১৩	০·১	১০৫·৮৭	১·০	৩২·৬৭	৩·২
১৯৮২–৮৩	২৮৮·৪২	১৩০৬	২২০·৮৪	৩৬	১১০৬৬	৪·৫	৩২·৮৭	০৬
১৯৮৩–৮৪	৩৪৯·৯২	১৫২·১	২৩০·০৬	৪·২	১১২·৪৩	১৬	৩৫·৬০	৮·৩
১৯৮৪–৮৫	৪১৬·৯৬	১৭৪·৮	২৩৮·৫৩	৩·৭	১১৩·৪৯	০·৯	৩৭·৮১	৬·২
১৯৮৫–৮৬	৪৬২·০১	১৮৫·০	২৪৯·৭৩	৪·৭	১১৮·০৭	৪·০	৩৮·৬৭	২·৩
১৯৮৬–৮৭	৫৩৯·১৭	২০৭·৮	২৫৯·৪৭	৩·৯	১১৮·২১	০	৪১·৪৫	৭·২
১৯৮৭–৮৮	৬০৩·৭৭	২২৮৬	২৬৪·৫৭	২·০	১১৬·৯৭	–১·০	৪৩·৫৯	৫·২
১৯৮৮–৮৯	৬৫৬·৪০	২৪৪·২১	২৬৮·৭৮	১৬	১১৬·৮৭	–০·১	৪৪·৭৯	২·৭
১৯৮৯–৯০	৭৪৪·০০	২৬৩৬৪	২৮২·২০	৫·০	১২৩·২৮	৫·৫	৪৮·৪২	৮·১
গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধি								
১৯৭৩–৮০				৫·৯		৩৬		১২·৭
১৯৮০–৮৫				৩·৭		২·৭		৫·২
১৯৮৫–৯০				৩·৪		১·৭		৫·১

উৎসঃ ওয়ার্ল্ড টেবিল ১৯৮৯–৯০ ও বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরীপ ১৯৮৯–৯০ থেকে রূপান্তরিত। ১৯৮৮–৮৯ ও ১৯৮৯–৯০ এর উপাত্তসমূহ ১৯৮৪–৮৫ এর মুল্যে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরীপে (১৯৮৯–৯০) উপস্থাপিত উপাত্তের ১৯৭৯–৮০ এর মুল্যে পরিবর্তিত রূপ।

পাচ্ছে। বিপরীত পক্ষে পুনরুৎপাদনের জন্য বিনিয়োগের অংশ সংকুচিত হচ্ছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই মোট জাতীয় উৎপাদনের গতিশীলতা বিনিয়োগ স্বল্পতায় দুর্বল হয়ে পড়ছে (সারণী–২)।

বাংলাদেশের বিনিয়োগ ক্ষমতা পড়ে যাওয়ার কারণটি তার বিনিয়োগের অর্থায়ন উৎসে নিহিত। এটা সর্বজন বিদিত যে, বাংলাদেশের বিনিয়োগযোগ্য অর্থ অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় থেকে সামান্য এবং বৈদেশিক সাহায্য থেকে সিংহভাগ আসে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ক্ষমতা অত্যন্ত নিম্ন। ১৯৭৩–৮০, ১৯৮০–৮৫ ও ১৯৮৫–৯০ মেয়াদে এ অনুপাত ছিল যথাক্রমে ১·৬%, ১·৫% ও ২·৯%।

উপরোক্ত পরিসংখ্যান মোতাবেক তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও বিনিয়োগ চাহিদার তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল ছিল। সেকারণে বাংলাদেশের জন্য বৈদেশিক সাহায্যই বিনিয়োগের জন্য অর্থ প্রাপ্তির বিকল্প ও প্রধানসুত্র (সারণী–২)।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বৃদ্ধি না পাওয়ার কারণ সরকারের রাজস্ব আয়ের চাইতে উচ্চহারে রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধি। রাজস্ব উদ্বৃত্তের হার সত্তরের দশকের শেষার্ধে বছরে গড়ে জাতীয় আয়ের ২৬ শতাংশ থেকে আশির দশকের শেষার্ধে ০৭ শতাংশে নেমে এসেছে। উন্নয়ন বাজেটের যে চলতি ব্যয় হয় তার হিসাব ধরলে সাম্প্রতিককালে সরকারী খাতে অবসঞ্চয় হচ্ছে বলা চলে।[১]

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ক্ষমতা তার জাতীয় আয়ের শতকরা ৩ ভাগের কম হলেও বিনিয়োগ করে এসেছে গত দশকে শতকরা ১০ ভাগ থেকে ১৫ ভাগ। অর্থাৎ বিনিয়োগের সিংহ ভাগই মিটে বৈদেশিক সাহায্য থেকে। অন্যকথায় বলা যায়, বাংলাদেশ বিনিয়োগ কতটা করতে পারবে সেটা মুলতঃ নির্ভর করে বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণের উপর। অর্থাৎ বাংলাদেশের বিনিয়োগের নিয়ামক হলো বৈদেশিক সাহায্য। বৈদেশিক সাহায্যের উত্থানপতন তাই বাংলাদেশের বিনিয়োগের মাত্রাকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে। সত্তরের দশকে জাতীয় আয়ের অংশ হিসেবে বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির হার বৃদ্ধির সাথে সাথে বিনিয়োগ হারও বেড়েছে। বৈদেশিক সাহায্য –জিডিপি অনুপাত ১৯৭৩–৭৪ সালে ৫·২% থেকে বেড়ে ১৯৭৯–৮০ সালে ৯·৬% হয়। একই সময়ে বিনিয়োগ–জিডিপি অনুপাত ৭·২% থেকে বেড়ে ১৫·১% হয়। কিন্তু ১৯৮১–৮২ সাল থেকে উভয় অনুপাতই হ্রাস পেতে থাকে। ঐ বছর বৈদেশিক সাহায্য–জিডিপি অনুপাত ৯·৪% থেকে কমে ১৯৮৯–৯০ সালে ৭·৮% এ নেমে আসে। একই সময়ে বিনিয়োগ –জিডিপি অনুপাত ১৫% থেকে ১১·২% এ হ্রাস পায় (সারণী–২)।

১। দৈনিক ইত্তেফাকঃ ৯ই এপ্রিল, ১৯৯১, ডঃ ওয়াহিদউদ্দীন মাহমুদের নেতৃত্বে গঠিত টাস্কফোর্স রিপোর্ট।

সারণী– ২

বিনিয়োগ –জিডিপি, সঞ্চয়–জিডিপি ও বৈদেশিক সাহায্য–জিডিপি অনুপাত

(বিলিয়ন টাকা)

বৎসর	মোটদেশজ উৎপাদন চলতি মুল্যে	মোট বিনিয়োগ চলতি মুল্যে	বৈদেশিক সাহায্য চলতি মুল্যে	মোট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় চলতি মুল্যে	বিনিয়োগ জিডিপি অনুপাত (%)	বৈদেশিক সাহয্য –জিডিপি অনুপাত (%)	অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়–জিডিপি অনুপাত (%)
১৯৭৩–৭৪	৭১·০৯	৫·৪০	৩·৬৭	০·৪৩	৭·২	৫·২	০·৬
১৯৭৪–৭৫	১২৫·৭৪	৭·৮০	৮·০০	১·২৩	৬·২	৬·৪	১·০
১৯৭৫–৭৬	১০৭·৪৬	১০·৯৫	১১·৮৮	–৩·০১	১০·২	১১·০	–২·৮
১৯৭৬–৭৭	১০৫·৩৬	১২·৬৫	৮·২৭	৭·৩০	১২·০	৫·৬	৬·৯
১৯৭৭–৭৮	১৪৬·৩৭	১৭·০৫	১২·৬০	৩·১৮	১১·৬	৮·৬	২·২
১৯৭৮–৭৯	১৭২·৮২	১৯·৫১	১৫·৭০	২·৬৪	১১·৩	৯·১	৯·৪
১৯৭৯–৮০	১৯৭·৯৮	২৯·৮০	১৮·৯৩	৪·২৩	১৫·১	১·৬	২·১
১৯৮০–৮১	২৩৩·২৬	৩৭·২৩	১৮·৬৮	৭·৫০	১৬·০	৮·৩	৩·২
১৯৮১–৮২	২৬৫·১৪	৩৯·৮৪	২৪·৮৪	১·০২	১৫·০	১·৪	০·৪
১৯৮২–৮৩	২৮৮·৮২	৩৯·২১	২৭·৯৭	০·৮৮	১৩·৬	৯·৭	০·৩
১৯৮৩–৮৪	৩৪৯·৯২	৪২·৭৫	৩১·৬৫	৩·৮৭	১২·২	৯·০	১·১
১৯৮৪–৮৫	৪১৬·৯৬	৫২·০১	৩৩·০০	৯·৪৯	১২·৫	৭·৯	২·৩
১৯৮৫–৮৬	৪৬২·০১	৫৪·৬৮	৩৯·০৩	১১·২২	১১·৮	৮·৪	২·৪
১৯৮৬–৮৭	৫৩৯·১৭	৬৬·৮৬	৪৮·৮৬	১৮·৮৭	১২·৪	৯·১	৩·৫
১৯৮৭–৮৮	৬০৩·৭৭	৭১·৩৬	৫১·২৬	১৬·৪২	১১·৮	৮·৫	২·৭
১৯৮৮–৮৯	৬৫৬·৪০	৭০·৩৮	৫৩·৬৩	১৬·৬২	১০·৭	৮·২	২·৫
১৯৮৯–৯০ (আনুমানিক)	৭৪৪·০০	৮৩·২৭	৫৮·৪৫	২৭·৫০	১১·২	৭·৮	৩·৭
<u>গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধি</u>							
১৯৭৩–৮০					১০·৫	৭·৯	১·৬
১৯৮০–৮৫					১৩·৯	৮·৯	১·৫
১৯৮৫–৯০					১১·৬	৮·৪	২·৯

উৎসঃ ওয়ার্ল্ড টেবল, ১৯৮৯–৯০ এবং বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরীপ ১৯৮৯–৯০ থেকে রূপান্তরিত।

উপরোক্ত তথ্যানুসারে বাংলাদেশে বৈদেশিক সাহায্যের অন্তঃপ্রবাহ কমে আসছে যার প্রভাব বিনিয়োগের উপর সুস্পষ্ট। দেশে বৈদেশিক সাহায্যের অন্তঃপ্রবাহ মন্দীভূত হওয়ার কারণ দু'টি ঃ এক, বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণ ব্যবহার ক্ষমতা সম্পর্কে দাতাগোষ্ঠীর

সন্দেহ এবং দুই, পুর্ব ইউরোপের রাজনৈতিক পরিবর্তনজনিত কারণে তথায় পশ্চিমা দেশগুলির বর্ধিত হারে সাহায্য দেয়ার আগ্রহ। তবে শেষোক্ত কারণটির কার্যকারিতা অতি সাম্প্রতিক কালের অর্থাৎ ১৯৮৯ সাল থেকে। সুতরাং ঋণের সদ্ব্যবহারে বাংলাদেশ দাতা দেশগুলির সামনে খুব একটা ভাল উদাহরণ রাখতে পারেনি।

বিনিয়োগ পড়ে যাওয়ার কারণ কেবলমাত্র জাতীয় আয়ের আনুপাতিক হারে বৈদেশিক সাহায্যের অন্তঃপ্রবাহ সংকীর্ণ হয়ে আসাই নয়। যে অভ্যন্তরীণ কারণটি বিনিয়োগ হ্রাসের অন্যতম প্রধান নিয়ামকের ভুমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে সেটি হলো, দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমুহ কর্তৃক সত্তর ও আশির দশকে প্রদত্ত ঋণ আশানুরুপহারে সময়মত ফেরত না আসা এবং প্রদত্ত ঋণের একটা অংশ ক্রমবর্ধমানহারে তামাদি হয়ে যাওয়া। ফলে ব্যাংকের অধীনস্থ বিনিয়োগযোগ্য অর্থের পুনঃসঞ্চালন হার ক্রমাগত পতনের সম্মুখীন। একটিগবেষণাফলাফল[২] থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব, প্রদত্ত ঋণ আদায়ে প্রয়োজনীয় তদারকির অভাবে বিশেষায়িত ঋণদান প্রতিষ্ঠানসহ বাণিজ্যিক ব্যাংক গুলির (সরকারী ও বেসরকারী) প্রদত্ত ঋণের একটা বড় অংশ তামাদি হয়ে যাচ্ছে। অনেক সময় বলা হয় ব্যাংক ঋণ তামাদি হওয়ার অন্যতম কারণ ঋণ গ্রহণকারী অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠানের রুগ্ন হয়ে পড়া। অনুসন্ধানে জানা যায়, ব্যাংক থেকে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে অর্থ গ্রহণের পর ইচ্ছাপুর্বকভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠানকে রুগ্ন ঘোষণার প্রবণতা অনেকাংশেই ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে কাজ করে। এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য থাকে গৃহীত ঋণের সুদ মওকুফ করে নেয়া এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানকে দেওলিয়া ঘোষণা করে ঋণ থেকে অব্যাহতি পাওয়া।

৩. *দিক নির্দেশনার মৌল প্রশ্নঃ*

সংক্ষেপে বলা যায়, জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধিহার স্তিমিত হওয়ার কারণ মুলতঃ তিনটিঃ (ক) অতি নিম্ন জাতীয় সঞ্চয় হার (খ) বৈদেশিক সাহায্য–জিডিপি অনুপাতের ক্রমবর্ধমান পতন এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ঋণযোগ্য অর্থের সঞ্চালন হার বৃদ্ধিতে অপারগতা। এক্ষেত্রে জাতীয় অর্থনীতির দিক–নির্দেশনার সাথে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি প্রশ্ন অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এক, জাতি প্রায় সম্পূর্ণ বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর প্রচলিত উন্নয়ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে কিনা? বিশেষ করে যখন বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হচ্ছে। জাতি বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহারক্ষমতা বাড়িয়ে তার অন্তঃপ্রবাহ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর উন্নয়ন তৎপরতার ধারা অব্যাহত রাখবে নাকি বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরতা কমিয়ে দিয়ে অভ্যন্তরীণ সম্পদ–নির্ভর উন্নয়ন কর্মপ্রচেষ্টা শুরু করবে? সাহায্য গ্রহণ একেবারেই বন্ধ করে দিয়ে নিজস্ব সম্পদ নির্ভর অত্যন্ত কঠিন উন্নয়ন কৌশলের ধারা গ্রহণ করবে? দুই, স্বল্প বৈদেশিক সাহায্য–নির্ভর অথবা বৈদেশিক সাহায্য–হীন উভয় পরাকৌশলই ইতমধ্যে সূচিত জাতীয় আয়ের মন্দীভূত প্রবৃদ্ধিকে আরও ত্বরান্বিত করবে যদি না অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বৃদ্ধি ও তা কাজে

২· আব্বাস, এস, এম, আলী "প্রচলিত ও লাভ–লোকসানে অংশ গ্রহণকারী ব্যাংক ব্যাবস্থার তুলনামুলক দক্ষতা অধ্যায়ন" শীর্ষক পিএই ডি গবেষণা অভিসন্দর্ভ (খসড়া),এপ্রিল, ১৯৯১।

লাগানোর বিকল্প এবং ফলপ্রসু পদ্ধতি উদ্ভাবন করা সম্ভব না হয়। সুতরাং অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বৃদ্ধি ও স্বল্প বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর উন্নয়ন কৌশল এবং বৈদেশিক সাহায্যহীন কেবলমাত্র অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় নির্ভর কর্মকৌশল–এদু'টির মধ্যে জাতি কোনটি বেছে নেবে? তিন, উপরোক্ত বিকল্পগুলির মধ্যে যেটিই গ্রহণ করা হোক না কেন জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি হার স্তিমিত হয়ে পড়ার তৃতীয় কারণটি অপসারণ যে কোন অবস্থায়ই প্রয়োজনীয়। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে বিনিয়োগ ফলপ্রসু করতে না পারলে বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর বা বৈদেশিক সাহায্যবিহীন অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় নির্ভর কোন কৌশলই বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না। অতীতের তুলনায় পুর্বোল্লিখিত যে কোন উন্নয়ন বিকল্পের অনুসরণ বাংলাদেশের জন্য অধিকতর ক্লেশদায়ক হবে। এমতাবস্থায় কষ্টার্জিত বিনিয়োগযোগ্য সম্পদ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিনিয়োগ ও সময়মত ফেরত আনার মাধ্যমে পুনঃসঞ্চালনের হার বৃদ্ধি করতে না পারলে কোন বিকল্পই সফল হবার নয়। তাই সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপার সরকার ব্যাংকের স্বাভাবিক ও নিয়ম মাফিক কর্মতৎপরতার উপর থেকে রাজনৈতিক প্রভাবের দুষ্ট প্রভাব ছিন্ন করবেন কিনা? ব্যাংক ব্যবস্থাপনার যাবতীয় স্তরে সরকার জওয়াবদিহীর ব্যবস্থা চালু করতে আগ্রহী কিনা। ঋণ গ্রহণ করে ইচ্ছাকৃতভাবে জনগণের অর্থ আত্মসাৎ করার সকল প্রচেষ্টা ব্যাংক কর্তৃক রোধের জন্য ব্যাংককে পর্যাপ্ত পরিমাণ আইনগত ক্ষমতা দিতে সরকার রাজী কিনা? তৃতীয়টির জন্য প্রয়োজন আন্তরিক রাজনৈতিক অঙ্গীকার যা কেবলমাত্র একটি জন প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের কাছ থেকেই আশা করা যায়।

৪. *দিক–নির্দেশনাঃ বিকল্প বাছাই*

নিম্ন সঞ্চয় ক্ষমতার পাশাপাশি বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা সংকুচিত হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জন্য উন্নয়ন বিকল্পের কোনটাই সহজ নাই। সহজ নয় এ অর্থে যে, স্বল্প পরিসম্পদ নিয়ে দুর্বল সম্পদ–সমাবেশ ক্ষমতা ও সম্পদ ব্যবহার কাঠামো এবং প্রতিশ্রুতিশীল রাজনৈতিক দলীয় সরকারের অনুপস্থিতিতে পুর্বে উল্লেখিত বিকল্পগুলির বাস্তবায়ন বাংলাদেশের চলমান আর্থ–সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বেশ কঠিন। অত্যন্ত জীর্ণ কর ব্যবস্থাপনার কর ফাঁকি রোধ ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বৃদ্ধি ও অন্যান্য উপায়ে সম্পদ সমাবেশের জন্য উদ্ভাবনী ও ফলপ্রসূ উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব না হলে দেশজ সম্পদ–নির্ভর উন্নয়ন কৌশল অনুসরণ ঝুঁকিপুর্ণ। দেশজ সম্পদ নির্ভর উন্নয়ন কৌশল দু'রকম হতে পারে। এক, কেবলমাত্র অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় থেকে প্রাপ্ত সম্পদ সমাবেশের মাধ্যমে তার উপর ভিত্তি করে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ। দুই, বিনিয়োগ–জিডিপির বর্তমান অনুপাত ঠিক রেখে অভ্যন্তরীণ সম্পদ সমাবেশের হার যতটা বৃদ্ধি করা যাবে সেই হারে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরতা পর্যায়ক্রমে কমানো যেতে পারে। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে দ্বিতীয় বিকল্পটি সম্ভবতঃ বেশী গ্রহণীয়। তবে এই একই কৌশল গত দুই দশকে অনুসৃত হয়েছে। বর্ধিত হারে বিভিন্ন পরিকল্পনা দলিলে বৈদেশিক সাযায্যের উপর নির্ভরতা কমিয়ে অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের উপর জোর দেয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ক্ষমতা এখন পর্যন্ত জাতীয় আয়ের শতকরা তিন ভাগের নীচে অবস্থান

করছে। সুতরাং কর ব্যবস্থা ও অভ্যন্তরীণ সম্পদ সমাবেশের অন্যান্য উপায়ের যথোপযুক্ত প্রয়োগ ব্যতিরেকে শেষোক্ত কৌশলটিও অতীতের পুনঃসংস্করণ ছাড়া আর কিছুই হবে না। এজন্য কর ব্যবস্থাকে দুর্নীতিমুক্তকরণ এবং ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় ব্যাংকিং নর্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠা কল্পে রাজনৈতিক প্রভাব স্বজনপ্রীতি ইত্যাদির মত দুষ্ট ব্যাধি মুক্ত করার আশু প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ সমাবেশের জন্য কর ব্যবস্থা ঢেলে সাজাবার পাশাপাশি শুল্ক ফাঁকির ফাঁক-ফোকড় বন্ধ করার ব্যাপারেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

দিক-নির্দেশনার ব্যাপারটি কেবলমাত্র উন্নয়নের অর্থায়ন উৎস বিবেচনার মধ্যেই সীমিত নয়। বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা আরো দু'টি মৌলিক উদ্দেশ্যের সাথে সম্পৃক্ত। সেগুলি হলো, জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি উত্তরোত্তর বাড়ানো বা অব্যাহত রাখা এবং দারিদ্র নিরসন। বাংলাদেশের জন্য প্রবৃদ্ধিহার বৃদ্ধির চাইতে এটাকে আশির দশকের গড় মাত্রায় ধরে রাখাটাই এখন প্রাথমিক করণীয়। সেটা করতে হলেও বিনিয়োগ-জিডিপি হারের পতন রোধ করতে হবে। আর এখানেই যথোপযুক্ত দিক-নির্দেশনা স্থির করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা। বৈদেশিক সাহায্য সীমিত হয়ে পড়ার পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ সম্পদ সমাবেশ বাড়িয়ে তার ক্ষতি পুরণের সমস্যা। এটা পুর্বেই আলোচিত হয়েছে। এখানে যেটি যোগ করা যেতে পারে তাহলো, বৈদেশিক সাহায্যের স্বাভাবিক অন্তঃপ্রবাহ গ্রহণ করে নিলেও বাড়তি অভ্যন্তরীণ সম্পদ সমাবেশের উদ্যোগ নিয়ে বিনিয়োগ হারের পতনরোধ সম্ভব কিনা? এটি সম্ভব কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে। এক,সঞ্চয়- জিডিপি হার এতটা বাড়তে হবে যাতে বিনিয়োগ-জিডিপি হার পতন থেকে রক্ষা পায়। দুই, বিনিয়োগকৃত অর্থের তুলনামুলকভাবে বেশী উৎপাদনশীল ও দ্রুত ফলপ্রদায়ক খাতে ব্যবহার। এক্ষেত্রেও বিবেচ্য হওয়া উচিত চালু ও নতুন প্রকল্পের মধ্যে দ্রুত ফলদায়ক উৎপাদনশীল প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দের অগ্রাধিকার।৩

দারিদ্র পরিস্থিতির অবনতি ঠেকিয়ে রাখার জন্য প্রথম করনীয় প্রবৃদ্ধিহারের পতন রোধ করা। সেটি কিভাবে সম্ভব ইতপুর্বে আলোচিত হয়েছে। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় করণীয় হলো বিনিয়োগযোগ্য সম্পদ অপেক্ষাকৃত চরম দারিদ্র ক্লিষ্টদের নিকট এমনভাবে পৌছানো যাতে সেটি প্রথম পর্যায়েই ক্ষুন্নিবৃত্তিতে ব্যয় না হয়ে পুনরুৎপাদনে ব্যয় হয়ে জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে অবদান রাখে। এ জন্য অংশগ্রহণধর্মী বিকেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনা পদ্ধতি প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার প্রয়োজন রয়েছে এবং প্রশাসন ও জনগণকে বাঞ্চিত লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। দারিদ্র ঠেকানোর জন্য শ্রম প্রধান প্রযুক্তি গ্রহণ একটি কৌশল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। গ্রামীন শিল্প, গ্রামীন কর্মসংস্থান ইত্যাদি দারিদ্র নিরসণে সহায়ক ভুমিকা পালন করতে পারে।

কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি দারিদ্র নিরসণের অন্যতম উপায়। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হলো উচ্চ বেকারত্ব হার পরিস্থিতিতে সীমিত সম্পদ কোন্ অর্থনৈতিক শ্রেণীর জন্য কতটা ব্যয় করা হবে? সীমিত সম্পদকে ভিত্তি করে গ্রহণ করার মত কোন সহজ কর্মকৌশল

৩· টাস্কফোর্স রিপোর্টে সরকারী খাতে সামগ্রীক বিনিয়োগ পরিকল্পনার দু'টি প্রধান সমস্যা উল্লেখ করা হয়েছে। তাহলো প্রতিশ্রুত প্রকল্প সাহায্যের তুলনায় স্থানীয় মুদ্রায় সম্পদের ঘাটতি এবং সম্পদ সংস্থানের তুলনায় চলতি প্রকল্পের অত্যাধিক সংখ্যা। ফলে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নতুন প্রকল্পের জন্য প্রস্তাবিত মোট বাজেট বরাদ্দের সামান্যই অবশিষ্ট থাকবে।

এক্ষেত্রে নেই। সাধারণভাবে বলা যায়, দেশের মধ্যে আত্ম-কর্মসংস্থান বেছে নেয়ার মত দক্ষতার উন্নয়ন, সরকার ও বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সৃষ্ট বিরাজমান সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে অবহিতকরণ এবং সেগুলি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। বিদেশে কর্মসুযোগ সন্ধান সরকারীভাবে জোরদার করা যেতে পারে এবং এতদুপলক্ষে বিদেশ গমনের সুযোগ সুবিধার দ্বার আরো উম্মোচন করা যেতে পারে।

৫.উপসংহারঃ

বিগত দুই দশকে অনুসৃত বৈদেশিক সাহায্য-নির্ভর উন্নয়ন কৌশল উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। এটি জাতীয় অর্থনীতির অগ্রগতি ও স্বনির্ভরতা অর্জনে সহায়তার পরিবর্তে জাতিকে আরও বেশি পরনির্ভরশীল করেছে। জাতি না অভ্যন্তরীণ সম্পদসমাবেশ ক্ষমতা বাড়াতে পেরেছে,না বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহার ক্ষমতা প্রদর্শন করে বৈদেশিক সাহায্যের অন্তঃপ্রবাহের স্বাভাবিক গতি নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে জাতির সামনে উন্নয়ন কৌশল হিসেবে সহজ কোন বিকল্প খোলা নেই। রাষ্ট্রায়াত্তখাতের ক্রমবর্ধমান লোকসান, সংকীর্ণ কর ভিত্তি এবং দুর্বল ও দুর্নীতিপরায়ন কর-প্রশাসন অভ্যন্তরীণ সম্পদ সমাবেশ দুরুহ করে তুলেছে। অপর পক্ষে, বৈদেশিক সাহায্য তুলনামুলকভাবে কমে আসায় জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে। বর্তমান অবস্থায় কেবল অভন্তরীণ সম্পদ নির্ভর অথবা সম্পুর্ণতঃ বৈদেশিক সাহায্য-নির্ভর উন্নয়ন কৌশল কোনটাই জাতীয় আয়ের স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধি বজায় রাখার পর্যায়ে নেই। এমনকি সীমিত অভ্যন্তরীণ সম্পদের এবং বৈদেশিক সাহায্যের সমন্বয় ঘটিয়ে প্রধানতঃ বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর যে উন্নয়ন কৌশল গৃহীত হয়ে আসছিল সেটিও ভবিষ্যতে জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধির নিম্নমুখী গতি ঠেকিয়ে রাখতে পারবে বলে মনে হয় না।

এমতাবস্থায় অভ্যন্তরীণ সম্পদ সমাবেশ জোরদার করার জন্য প্রশাসন,সেকটর করপোরেশনসহ সর্ব পর্যায়ে দুর্নীতি ও অনুৎপাদনশীলতা বিদুরণ প্রশ্নে কঠোর রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। এটি অভ্যন্তরীণ সম্পদ সমাবেশ পরিস্থিতির উন্নতির বিধানের সাথে সাথে দেশের প্রতি দাতা দেশগুলির আস্থা ফিরিয়ে এনে বৈদেশিক সাহায্যের অন্তঃপ্রবাহ বাড়তে সহায়তা করবে। স্বল্প মেয়াদে অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের প্রচেষ্টা জোরদারের সাথে বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার কৌশল গ্রহণ জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধির নিম্নমুখী পতন ঠেকিয়ে রাখার জন্য জরুরী। তবে দীর্ঘমিয়াদী কৌশল হবে পর্যায়ক্রমে বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা কমিয়ে অভ্যন্তরীণ সম্পদ নির্ভর উন্নয়ন কৌশলের দিকে যাত্রা করা। কৌশল হিসেবে এটি পুরাতন নিঃসন্দেহে। তবে কৌশলটির মুল অভ্যন্তরীণ সম্পদ-সমাবেশ প্রচেষ্টা জোরদার করার বিষয়টি গত দুই দশকে বরাবরই উপেক্ষিত হয়েছে। এটির জন্য অকপট রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি, প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সর্বপর্যায়ের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার মত কর্মসুচী গ্রহণ করতে না পারলে অবস্থার কেবল পুনরাবৃত্তিইঘটবে।

গ্রন্থপঞ্জী

১· বিশ্বব্যাংকঃ বাংলাদেশ রিসেন্ট ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট এনড শর্টটার্ম্য প্রস্‌পেক্টস, মার্চ ১৩,১৯৮৯ঃ এশিয়া কান্ট্রি ডিপার্টমেন্ট–১।

২· বিশ্বব্যাংক ঃ ওয়ার্ল্ড টেবল, ১৯৮৯–৯০।

৩· আতিক রহমান ও তৃণা হকঃ প্রভার্টি এন্ড ইন্‌ইক্যুয়ালিটি ইন বাংলাদেশ ইনদি এইটিজ এন এনালাইসিস অব সাম্‌ রিসেন্ট এভিডেন্স, ডিসেম্বর '৮৮, বিআইডিএস রিসার্চ রিপোর্ট নং– ৯১।

৪· এস, এম, আলী আক্কাসঃ বাংলাদেশের বাণিজ্য কাঠামো ও বাণিজ্যনীতি –একটি সামগ্রীক পর্যালোচনা, প্রশাসনিক সমীক্ষা, ৩ য় বর্ষ ২য় সংখ্যা কার্তিক ১৩৯৬।

৫· এস, এম, আলী আক্কাস ঃ বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামোগত পুনর্বিন্যাসে বাণিজ্যনীতির ভূমিকা, প্রশাসন সাময়িকী, প্রথম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৯৭।

৬· বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জী ১৯৮৯–৯০।